ভূমিকা

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের আদপেই কি কোন সমন্বয় হওয়া সম্ভব, নাকি এদের মধ্যে সতত বিরাজ করছে এক নিরন্তর সংঘাত? এ প্রশ্ন অনেক পুরোন। বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে সমন্বয় করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং কৌশল লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সহ বাংলাদেশের অনেক মিডিয়ায়। শুধু সমন্বয়ের প্রচেষ্টাই নয় - সেই সাথে খুব কৌশলে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানও ছড়ানো হয়েছে, এমন কি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের প্রাচীন আয়াত আর শ্লোকের সাথে সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারকে - মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব, ডি.এন.এ, আপেক্ষিকতা, কৃষ্ণগহ্বর কিংবা কাল-প্রসারণ ইত্যাদি। কখনো বা চাঁদে আজান শুনে নীল আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কাহিনীও মিডিয়ায় জোরে সোরে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু, সত্যই কি প্রাচীণ ধর্মগ্রন্থগুলোতে আধুনিক বিজ্ঞানের অমনতর নিদর্শন রয়েছে? সত্যই নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে নেমে আজান শুনেছিলেন? সত্যই কি স্রষ্টা প্রকৃতিতে তার অস্তিত্বের বিবিধ আলামত রেখে গিয়েছেন? সত্যই কি বিজ্ঞান ঈশ্বরকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে? এ বইটিতে নির্মোহ এবং নিরপেক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি যুগে খুব ফলাও করে ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় কিংবা সম্প্রীতির কথা বলা হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস কারো অজানা নয়। খ্রীষ্টজন্মের পাঁচশ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাক্সু সিমন্ডের মত অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকেরা জানিয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহমাত্র, সূর্যকে ঘিরে অন্য সকল গ্রহের মত পৃথিবীও ঘুরছে। ধর্মবিরোধী এই মতামত প্রকাশের জন্য এদের অনেককেই সে সময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। এই 'কুফরি' মতবাদকে দুই হাজার বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস। বাইবেল বিরোধী এই সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচারের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোকে কিরকমভাবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল সে এক ইতিহাস। ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু ব্রুনোই নন, তার সমসাময়িক লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থোলোমিউ লিগেট সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। খ্রীষ্টের জন্মের চারশ পঞ্চাশ বছর আগে এনাক্সোগোরাস বলেছিলেন চন্দ্রের নিজের কোন আলো নেই। সেই সঙ্গে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আর চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এনাক্সোগোরাসের প্রতিটি আবিস্কারই ছিল ধর্মবাদীদের চোখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বর বিরোধিতা, ধর্ম বিরোধিতা আর অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ আর নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র এবং ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস ঘোষনা করলেন- মানুষের অসুস্থতার কারণ কোন পাপের ফল কিংবা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ হল জীবাণু। ওষুধ প্রয়োগে জীবাণু নাশ করতে পারলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে। প্যারাসেলসাসের এই 'উদ্ভট' তত্ত্ব শুনে ধর্মের ধ্বজাধারীরা হা রে রে করে উঠলেন। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্মবিরোধি মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হয়েছিল 'বিচার' নামক এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকেরা ব্রুনোর মতই প্যারসেলসাসকে মৃত্যুদন্ডে

দন্ডিত করেছিলো। প্যারাসেলসাসকে সেদিন জীবন বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছিলো। অত্যাচার আর নির্যাতন শুধু খ্রীষ্টানদের একচেটিয়া ভেবে নিলে ভুল হবে - আজকে মুসলিমরা ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের মত দার্শিনিকদের জন্য গর্ববোধ করে - কিন্তু সে সব দার্শনিকদের সবাই তাদের সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্য কিংবা মুক্তমত প্রকাশের কারণে মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত, নির্যাতিত কিংবা নিহত হয়েছিলেন।

আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের উপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনী পোড়ানোর মত তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোন নতুন আবিস্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায় আস্তাকুঁড়ে। তাতে আবশ্য লাভ হয় না কিছুই। অযথা গোলমাল বাধিয়ে নিজেরাই বরং সময় সময় হাস্যাস্পদ হন। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনো বিবর্তন তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনী গুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনো সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোল্লার দল প্রগতিশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিকদেরকে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এ তো গেল আমাদের মত দেশগুলোর অবস্থা। তথাকথিত 'উন্নত বিশ্বে' এখনো অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষত পাদ্রী আর মোল্লারা উপযাজক সেজে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দিতে আসে বিজ্ঞানীদের কোন গবেষণা নৈতিক, আর কোনটা অনৈতিক; কিংবা দাবী তুলে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনের পাশাপাশি 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করার। কিন্তু এ ধরণের দাবী কতটুকু যৌক্তিক? এ বইটিতে সে দাবীগুলোকে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন লেখকেরা।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের সঙ্ঘাত এড়াতে সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা কিছু চিন্তাবিদদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে 'স্বতন্ত্র বলয়' তত্ত্বের- ইংরেজীতে যাকে অভিহিত করা হয় 'ননওভারল্যাপিং ম্যাজেস্টেরিয়া' (Nonoverlapping Magisteria) নামে। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী স্টিফেন জে গুল্ড ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তার 'রকস অব এজেস' বইয়ে এমনি একটি মত দিয়েছিলেন এই বলে যে, বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান সম্পূর্ণ দুটি আলাদা বলয়ে - যে বলয় দুটি একে অপরের সাথে থাকে অসম্পৃক্ত। এক বলয়ে থাকে বিজ্ঞান - যার কাজ হচ্ছে ভৌত বাস্তবতার আলোকে প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া, আর অন্য বলয়ে অবস্থিত ধর্মের কাজ হচ্ছে নীতি নৈতিকতার চর্চা করা, এবং তার আলোকে সমাজ নির্মাণ করা। গুল্ড মনে করতেন, এভাবে দুই প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধাকে দুই বলয়ে আটকে রেখে সমূহ যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা যাবে। আমরা গুল্ডের 'স্বতন্ত্র বলয়' প্রবন্ধটি এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রবন্ধটি বাংলাদেশের পাঠকদের চিন্তাজগতে প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে স্টিফেন জে গুল্ডের প্রস্তাব খুব আকর্ষনীয় হিসেবে বিবেচ্য হলেও, সবাই যে এ প্রস্তাবকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন তা নয়। যেমন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স

তার 'বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ' প্রবন্ধে গুন্ডের প্রস্তাবটিকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। আমরা ওই প্রবন্ধটিকেও এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি। অধ্যাপক ডকিন্স ছাড়াও মাইকেল শারমার, পল কার্জ এবং ভিক্টর স্টেঙ্গারের মত চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন গুন্ডের প্রস্তাবটির ভিতরেই রয়ে গেছে আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি। এদের মতে, সত্যের প্রকৃতি কখনোই দুই বলয়ে বিভক্ত নয়। সামগ্রিকভাবে সত্যের সন্ধান করা যেতে পারে শুধুমাত্র একটি পদ্ধতিতেই - সেটা হল বৈজ্ঞানিক অণুসন্ধিৎসা। বৈজ্ঞানিক অণুসন্ধিৎসাকে 'ধর্মীয় বিশ্বাস' এর বলয়ে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অর্থই হল জোর করে সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, অপবিশ্বাস, কুসংস্কারের বাজার টিকিয়ে রাখা। বৈজ্ঞানিক অণুসন্ধিৎসার বলেই একটা সময় সম্ভব হয়েছে ভূকেন্দ্রিক সৌর-মডেলকে হটিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার - তা সে যতই ধর্ম বিরোধী হোক না কেন; কিংবা হটানো সম্ভব হয়েছে মাত্র ছয় হাজার বছরের পৃথিবীর বয়সের বদ্ধমূল ধারণাকে। বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার সনাতন ধারণাও পালটে গেছে। প্রার্থনায় কাজ হয় কিনা অথবা ইএসপি, টেলিপ্যাথি, জন্মান্তর বলে কিছু আছে কিনা কিংবা তন্ত্র-মন্ত্রে কারো প্রাণ-হরণ করা সম্ভব কিনা এগুলো বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের নিরিখে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ব্যক্তি বিশেষের মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতার কিংবা আধ্যাত্মিক এবং অপার্থিব অনুভূতির। এমনকি নীতি-নৈতিকতার ব্যাপার স্যাপার-যেগুলোকে ধর্মবাদীরা সবসময়ই নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলে ভাবেন, সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সেগুলোর উৎস এবং ক্রমবিকাশও আজ নির্ধারণ করেছে বিজ্ঞান।

যে সমস্যাগুলোকে এক সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরে বলে মনে করা হত, মনে করা হত বিজ্ঞান সে সব প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম, সেগুলোর অনেকগুলোই বিজ্ঞান আজ সমাধান করেছে কিংবা করতে চলেছে। সে সব প্রান্তিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ, নৈতিকতার উৎস, ধর্মের উৎপত্তি, জীবন-মৃত্যুর ব্যাখ্যা, মানব প্রকৃতির রূপ - এ ধরণের নানা আকর্ষনীয় বিষয়। সব কিছুর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছুনো না গেলেও, বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং প্রতিদিনই আমাদেরকে নতুন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে চলেছেন নিরলসভাবে। তবে ধার্মিক এবং ধর্মবেত্তাদের অনেকেই আবার দুঃখিত এবং শঙ্কিত হয়েছেন; তারা এ সমস্ত প্রান্তিক বিষয়ে আজকের বিজ্ঞানীদের এহেন গবেষণাকে নিয়েছেন তাদের বলয়ে অযাচিত প্রবেশ কিংবা বিশ্বাসের উপর আগ্রাসন হিসেবে। তাদের অনেকেই আবার ঢালাওভাবে মন্তব্য করেছেন, 'বিজ্ঞান কখনোই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না'। কখনো নিষেধের কিংবা নীতি-নৈতিকতার প্রাচীর তুলে গবেষণা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে করে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থামানো যায়নি।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে, এটা তো অস্বীকার করার জো নেই। বিজ্ঞানের তথা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে মুক্তমন (open mind) মুক্তান্বেষা (free inquiry), সংশয়ী মনোবৃত্তি (critical thinking), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) এবং পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ প্রাকৃতিক-জ্ঞান, যেটাকে ইংরেজীতে বলে - 'methodical naturalism'। বিজ্ঞান কোন অনুকল্পকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় না এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো, দেশ, কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতিভেদেও পরিবর্তিত হয় না। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

কিংবা প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো যে কোন দেশের গবেষণাগারে বসে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। বিজ্ঞান সে অর্থে সার্বজনীন। ধর্মও এক ধরণের সার্বজনীনতা দাবী করে, তবে তাদের 'সত্যতা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্ভর করে লোককথা, উপকথা, ঐশী বাণী, প্রত্যাদেশ, পবিত্র কিতাব গ্রন্থ, নবী-পয়গম্বর, সাধু সন্ত, ভিক্ষু কিংবা মোল্লাদের বচনের উপর। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' - সকল ধর্মেরই মূল উপজীব্য। কিন্তু এ সব আপ্তবাক্য কিংবা ঐশী বচনের চেয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের কথাই আজ অনেক ক্ষেত্রে বেশী গ্রহণীয়। তাই মহাবিশ্বের জন্ম এবং পরিণতি নিয়ে একজন পোপ কিংবা বায়তুল মোকারমের খতিবের চেয়ে স্টিফেন হকিং কিংবা ওয়াইবার্গের মত বিজ্ঞানীদের মতামতই এ সময়ে সচেতন মানুষদের কাছে বেশী আকর্ষনীয়।

কিন্তু তারপরও সমাজে ধর্মের একটা বড় ভূমিকা আছে। ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি ধর্মগুলো মানব ইতিহাসে অনেক বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সমস্ত ধর্মের প্রেরিত পুরুষ, নবী রসুল আর ধর্মগুরুদের উৎসারিত বাণী, পবিত্র গ্রন্থগুলোর অনুপ্রেরণা, প্রত্যাদেশসমূহ এবং তাদের তৈরি আধ্যাত্মিকতা, রীতি-নীতি, কলা, কৃষ্টি, প্রার্থণা-গীত, সঙ্গীত -শ্যামা সঙ্গীত, কাওয়ালী, গজল, ভজন; কিংবা মন্দির, মসজিদ, প্যাগোডা, ক্যাথেড্রাল, নামাজ, রোজা, পূজা-পার্বন, বড়দিন, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ঈদ কিংবা মহরম - এগুলো আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সমাজ সভ্যতার বিন্যাসে , কিংবা ইতিহাসের পরিক্রমায় ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী নিয়ামক। আর এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। কাজেই সমাজ এবং ইতিহাস বিশ্লেষণে ধর্মকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতেই হবে। সমাজ গঠনে কি বিশ্বাসের একটা বড় ভূমিকা আছে? বিশ্বাস কি তবে মানব মনে প্রোথিত ছিল প্রথম থেকেই? কিংবা সমাজ বিবর্তনের ধারায় টিকে থাকার সংগ্রামে 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা কোন বাড়তি উপযোগিতা তৈরি করেছিল? আবেগ দিয়ে নয়, বৈজ্ঞানিক ভাবেই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা জরুরী। এ বইয়ে লেখকেরা আধুনিক গবেষণা এবং তথ্যের আলোকে সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এ বইয়ের ***প্রথম অধ্যায়ে*** মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা আছে কিনা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢালাওভাবে সবসময়ই মনে করা হয়েছে ঈশ্বরই হচ্ছে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টির' পেছনে প্রথম কারণ। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে এই সজ্ঞাত ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর পরের লেখাটি আলবার্ট আইনস্টাইনের। মিডিয়ায় খুব ফলাও করে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানী কত বড় ধার্মিক ছিলেন তা প্রচার করা হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে আইনস্টাইনের নিজের লেখা থেকেই (দিগন্ত সরকার অনুদিত) পাঠকেরা এর সত্যতা খুঁজে নিতে পারবেন। আইনস্টাইন খুব পরিস্কার করেই বলেছেন - 'মানুষের নৈতিকতার জন্য তো ধর্মের কোনো দরকারই নেই, দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা, শিক্ষা আর সামাজিকতার। মানুষ যদি পরকালের শাস্তির কথা ভেবে নৈতিক হয়, সেই নৈতিকতার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় থাকে?' সম্প্রতি আইনস্টাইনের একটি নতুন চিঠি নিলামে একশ সত্তর হাজার পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে। সে চিঠিতে আইনস্টাইন ঈশ্বর বিশ্বাসকে 'বালখিল্য কুসংস্কার' (childish superstition) হিসবে অভিহিত করেছেন। দিগন্ত সেই চিঠিটির প্রয়োজনীয় অংশটুকু অনুবাদ করে এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস

নিয়েছেন। এ ছাড়াও এতে সংকলিত হয়েছে আইনস্টাইনের বিভিন্ন রচনা থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক উদ্ধৃতি। এ অধ্যায়ের পরের লেখাটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের। এ লেখাটিতে ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে আইনস্টাইনের মনোভাবকে আরো গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন ডকিন্স। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের পুরোধা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অজয় রায়। সম্মানিত পাঠকেরা এ প্রবন্ধ দুটি থেকে আইনস্টাইনের মনোজগৎ সম্বন্ধে নিজেরাই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। এর পরের প্রবন্ধটি মুক্তমনা সদস্য পদার্থবিদ অপার্থিবের। 'স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের আস্তিত্ব' নামের প্রবন্ধটিতে অপার্থিব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আসলে পরস্পর-বিরোধী। মন্দের যুক্তি তথা 'আর্গুমেন্ট অব ইভিল'-এর নিরিখে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অপার্থিব প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন শক্তিশালী যুক্তিতে। এর পরের প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. অজয় রায়। তিনি একজন অজ্ঞেয়বাদী পদার্থবিদের দৃষ্টিকোন থেকে ঈশ্বর এবং ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ অধ্যায়ের পরবর্তী প্রবন্ধটি এসেছে একজন সংশয়ীর দৃষ্টিকোন থেকে। আহমাদ মোস্তফা কামাল এ প্রবন্ধটিতে বলতে চেয়েছেন, লালন, ওমর খৈয়াম, মির্জা গালিব, হাফিজ, রুমি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন এঁরা কেউই আস্তিক ছিলেন না; আবার তারা যে নাস্তিক ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। জনাব কামালের মতে, এঁরা ছিলেন সংশয়ী। এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধটিতে আমি মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং ঈশ্বর নিয়ে একটি দার্শনিক আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছি।

বইয়ের ***দ্বিতীয় অধ্যায়ে*** পরিকল্পনা, ডিজাইন ও ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারগুলো পশ্চিমা মিডিয়ায় ইদানিং নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে, বিশেষত, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প বাজারজাত হবার পর থেকেই। ধর্মবাদীদের অনেকে সূক্ষ সমন্বয়ের যুক্তি (Fine tuning argument) এবং নরত্ববাচক যুক্তি (Anthropic argument) প্রভৃতি যুক্তিমালা সাজিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজবার চেষ্টা করছেন। সেই 'যুক্তি'গুলোর একটি চমৎকার জবাব দিয়েছেন প্রখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তার 'বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে?' প্রবন্ধের মাধ্যমে। প্রবন্ধটি আমাদের জন্য অনুবাদ করেছেন ড. প্রদীপ দেব। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের। তাঁর 'পরিকল্পিত মহাবিশ্ব?' প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে কোন অপার্থিব সত্ত্বার পরিকল্পণা বা ডিজাইন জড়িত ছিল না। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন দিগন্ত সরকার। এর পরের প্রবন্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সৃষ্টির যুক্তিকে খন্ডন করেছেন অপার্থিব। স্রষ্টা এবং ধর্ম যখন অসঙ্গতির - প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সৈকত চৌধুরী স্রষ্টা এবং ধর্ম বিশ্বাসে যুক্তির সংকটগুলোর কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন। এর পরের লেখাটিতে আমি দেখিয়েছি যে, বিবর্তনের যেহেতু কাজ করে শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীদেহে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখা যায়, কোন সর্বজ্ঞ স্রষ্টার নিখুঁত ডিজাইনে কিংবা পরিকল্পনায় তৈরি হলে এমনটি ঘটতো না। 'বাগানে গোপনে একজন মালী আসে অথবা আসে না' প্রবন্ধে শোহেইল মতাহির চৌধুরী জন উইজডমের 'ধর্মের দর্শন' বইটি থেকে নেওয়া বিখ্যাত 'মালী'-র রূপকের সাহায্যে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, বিবদমান দুই পক্ষ মহাবিশ্ব সম্পর্কে কিংবা এর পেছনে কোন

ডিজাইনার থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করলেও সেটি যে জগৎ সম্পর্কে সত্য হবে তা হলফ করে বলা যাবে না। এই অধ্যায়ের শেষ লেখাটিতে বন্যা আহমেদ আর আমি আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কিভাবে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার আর অবৈজ্ঞানিকতা উস্কে দেওয়া হচ্ছে, আর এগুলোর পেছনে কলকাঠি কারা নাড়ছেন- তার একটি বিস্তৃত বর্ণনা হাজির করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে বইয়ের কেন্দ্রীয় চিন্তার উপস্থাপন ঘটেছে। এ অধ্যায়টিতে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্ঘাত নিরন্তর চলতে থাকবে থাকবে নাকি থাকবে সহাবস্থান। প্রথম লেখাটিতে (বিজ্ঞানমনস্ক ধারা, ধর্মাচ্ছন্ন স্রোত) ড. ইরতিশাদ আহমেদ বলিষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। তার মতে, বিজ্ঞান যেখানে নিত্য নতুন জ্ঞানের সন্ধান করে চলেছে ধর্ম তখন ভুল ধারণা, মিথ্যা গল্প-কাহিনী আর আজগুবি কল্পনার উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। তিনি মনে করেন, শুধু বিজ্ঞান নয়- সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবেও ধর্ম পশ্চাদপদ কারণ ধর্ম মানুষকে রুচিশীল হওয়ার কোন প্রেরণা যোগায়না; ধর্ম মুল্যবোধের উৎস হিসাবেও অপ্রয়োজনীয়, এবং ধর্ম এমন কি আধ্যাত্মিকতার বিকাশেও নিতান্তই অপ্রতুল এবং নিম্নমানের। এর পরে 'ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম হচ্ছে ভাববাদের সর্বোচ্চ রূপ। সেখানে যুক্তির কোন স্থান নেই। যুক্তিহীন বিশ্বাসই হল ধর্মের প্রধান শক্তি। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন তা নয়। বিজ্ঞান নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক। ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস নামক তৃতীয় প্রবন্ধে ড. ওয়াহিদ রেজা ধর্মচেতনা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিভিন্ন অযৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন - মানুষের ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস আপাতঃ দৃষ্টিতে চকমকে সত্যের মতো মনে হলেও আসলে অবাস্তব ও অলীক। এর পরের প্রবন্ধ 'ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস'-এ ড. প্রদীপ দেব ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার রক্তাক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা বনাম বিবর্তনতত্ত্বের সাফল্য' প্রবন্ধটিতে দিগন্ত সরকার দেখিয়েছেন কি ভাবে কিভাবে বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্পগুলোকে ধীরে ধীরে হটিয়ে দিচ্ছে। একটা সময় মানুষ সমতল পৃথিবীর ধারণায় নিমজ্জিত ছিল, তখন বিজ্ঞানীরাই মানুষকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আর কেউ সমতল পৃথিবীর কল্পনায় বিভ্রান্ত হয় না। দিগন্ত আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে ক্রমাগত প্রমাণ ও পরীক্ষার সাহায্যে বিবর্তনবাদও জনমানসে একই ভাবে স্থান করে নেবে। বন্যা আহমদে অনুদিত 'ডারউইনিজমের আতঙ্ক' প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর দেখিয়েছেন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত একটি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও বিবর্তনবাদ কেন এখনো ধর্মান্ধদের মধ্যে 'আতংক' হিসেবে বিরাজ করছে। 'বিজ্ঞান ও ইসলাম - অন্তিম সংঘাত' প্রবন্ধটিতে টড পিকক দেখিয়েছেন আজকের ইসলামিক দুনিয়া সত্যিকার বিজ্ঞান চর্চার অভাবে কিভাবে ধীরে ধীরে আরো পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তানবীরা তালুকদার। এর পরের প্রবন্ধটিতে প্রখ্যাত মানবতাবাদী অধ্যাপক এবং সেক্যুলার হিউম্যানিজমের প্রতিষ্ঠাতা পল কার্জ বর্ণনা করেছেন কেন তিনি ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে সংশয়বাদী। পরের প্রবন্ধটি স্টিফেন জে গুল্ডের বহুল বিতর্কিত 'অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বলয়', যা আমি এ লেখার প্রথমদিকে আলোচনা করেছি। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির শিক্ষার্থী খান মুহাম্মদ। গুল্ডের প্রবন্ধটির সাথে একমত পোষণ না করে প্রবন্ধটির বিভিন্ন যুক্তি খন্ডন করেছেন অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স। ডকিন্সের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তানবীরা তালুকদার। এর পরের প্রবন্ধে শঙ্কর রায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক মোঃ জানে আলম দেখিয়েছেন, আধুনিক ধর্মবেত্তারা যতই প্রানান্তকর প্রয়াস পাক না কেন, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমাণ করা কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সোনার পাথরবাটির মত অসম্ভব একটি প্রকল্প। কিন্তু তারপরও ধর্মকে তার অবস্থান ও আমজমগণের মানসে তার সুদৃঢ় শিকড়কে অস্বীকার করাও অসম্ভব একটি ধারণা বলে মনে করেন তিনি। তাই তিনি তার প্রবন্ধ 'ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত-সমন্বয়ের রণনীতি-রণকৌশল' -এ তিনি সমূহ সঙ্ঘাত এড়াতে কিছু প্রায়োগিক রণনীতি ও রণকৌশলগত একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন। 'ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান' প্রবন্ধে আবুল হোসেন খোকন দেখিয়েছেন যে, ঢালাওভাবে যে মনে করা হয় ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের আগে জাহেলিয়া যুগে পৃথিবীর মানুষ ছিল পুরো অসভ্য-বর্বর এবং পশুতুল্য, আর ইসলাম এসে আমাদের সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে, এটি একেবারেই মিথ্যা। তিনি আরো মনে করেন, এখানে ধর্ম-বিজ্ঞানের একে-অপরের সমন্বয়ের কিছু নেই। বরং আছে সংঘাত, এবং অনিবার্যভাবে আছে মিথ্যার ধবংস বা মৃত্যু। এ অধ্যায়ের 'ধর্ম নয় বিজ্ঞান' শীর্ষক শেষ প্রবন্ধে আকাশ মালিকও প্রায় একই অভিমত দিয়েছেন যে, ধর্ম নয়, বরং বিজ্ঞানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা; তাই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অর্থহীন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এসেছে ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি। 'বিজ্ঞানময় কিতাব' নামের প্রথম প্রবন্ধটিতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে ইদানিং শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর বিভিন্ন আয়াত বা শ্লোককে বিভিন্ন চতুর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পরের প্রবন্ধটিতে জাহেদ আহমেদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথায় বিজ্ঞান ধর্ম এবং অপবিজ্ঞানের সীমারেখা টানা যেতে পারে এ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম সংগত কারনেই - 'বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞান - কোথায় টানব সীমারেখা?'। এর পরের প্রবন্ধটিতে নাস্তিকের ধর্মকথা নামের লেখক দেখিয়েছেন ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করা আসলে নিম গাছে আমের সন্ধান পাওয়ার মতই অবাস্তব এনং হাস্যকর। 'বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস' প্রবন্ধটিতে অপার্থিব ধর্মবাদীরা যে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে যুক্ত করে দাবী করেন যে, ধর্মের বিভিন্ন আয়াত ও শ্লোকগুলো পাঠ করেলে বিজ্ঞানকে পাওয়া যায় - এই দাবীর ভ্রান্তি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এর পরে 'ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে খান মুহাম্মদ দেখিয়েছেন ইসলামের প্রচীন পৌরাণিক কাহিনী গুলোকে কিভাবে নানা ধরণের অপব্যাখ্যা করে বৈজ্ঞানিকতার লেবাস পরানো হচ্ছে। এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধ 'ভগবদ্গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য' -এ অনন্ত বিজয় দেখিয়েছেন কিভাবে হিন্দু মৌলবাদীরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে অর্থহীন ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করে চলেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কতটা ধর্ম থেকে উৎসারিত তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। নৈতিকতা ব্যাপারটিকে কেবল স্বর্গীয় ব্যাপার মনে করে ব্যাপারটার উপর এক ধরণের ঐশ্বরিক আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ ধরণের দাবী কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে আমি প্রথম প্রবন্ধ - 'নৈতিকতা কি শুধুই

বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?' -এ আলোচনা করেছি। ধর্মই নৈতিকতার উৎস - এই সজ্ঞাত এবং বহুল প্রচলিত ধারণাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন অপার্থিব তাঁর প্রবন্ধে। 'হতবুদ্ধি, হতবাক' প্রবন্ধে মীজান রহমান কোরান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ইসলাম ধর্মের নৈতিকতা অনেক ক্ষেত্রে অমানবিক শুধু নয়, যুক্তি বুদ্ধিহীনও বটে। আমাদের মূল্যবোধ যে আসলে ঈশ্বর হতে আগত কিছু নয় - বরং সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই এটি মানব সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে - তা আলোচনায় এনেছেন অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর। প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন মুন্সি কেফায়েতুল্লাহ। এই ধারনাটিকেই পরের প্রবন্ধ 'বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব'-এ আরো বিস্তৃত করেছেন অপার্থিব- ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তনের পটভূমিকায় নৈতিকতার উদ্ভব ও বিকাশকে। সম্পূরক আরেকটি প্রবন্ধে দিগন্ত সরকার রিচার্ড ডকিন্সের 'স্বার্থপর জিন' তত্ত্বের আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এমনকি আত্মত্যাগের প্রবণতার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছেন। এর পরের প্রবন্ধ 'প্রসংগ - নৈতিকতা'তে পুরুজিত সাহা নৈতিকতার কিছু দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে নাস্তিকতা নিয়ে কিছু ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে চেয়েছেন স্যাম হ্যারিস। প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন দিগন্ত সরকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক অথ্য ও তত্ত্বের আলোয় ধর্মের উৎস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি দিগন্ত সরকারের। এর পরের প্রবন্ধটি উত্তর পুরুষের। দুটো প্রবন্ধেই কিছু প্রাঞ্জল উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন মিথ কালের পরিক্রমায় ধর্ম হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে। প্রথম প্রবন্ধটি জীববিজ্ঞান (দলগত নির্বাচন, মিম বিন্যাস প্রভৃতি) দৃষ্টিকোন থেকে, দ্বিতীয়টি সমাজবিবর্তনের দৃষ্টিকোন থেকে। 'ধর্মের উপযোগিতা' প্রবন্ধে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স ব্যাখ্যা করেছেন ডারউইনীয় বিবর্তনের ধারায় ধর্মের ভূমিকা এবং অস্তিত্বের কারণ। এর পরের প্রবন্ধে আশিক মাহমুদ রূপম 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মানব মনে 'প্রোথিত' ছিল কিনা তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধটিতে বিশ্বাসে বিবর্তনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন আধুনিক তথ্যের আলোকে। 'মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল?' নামের প্রবন্ধটিতে বন্যা আহমেদ দেখিয়েছেন, মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির অন্য প্রানীদের তুলনায় আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও কোন স্বর্গীয় স্পর্শে এর উদ্ভব ঘটেনি, ঘটেছে বিবর্তনেরই ক্রমধারায়। এর পরের প্রবন্ধটিতে অপার্থিব বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তী প্রবন্ধে খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস) রবার্ট এইচ লোভির বিশ্লেষণ হাজির করে অভিমত দিয়েছেন যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি যুগেই ছিল, এখনো এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধটিতে সামাজিক পরিচয়ের দৃষ্টিতে ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. বিপ্লব পাল ।

সপ্তম অধ্যায়ে আলৌকিক বলে কথিত বিভিন্ন ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেছেন লেখকেরা। প্রথম প্রবন্ধটিতে অনন্ত বিজয় দাশ ঈশ্বর দর্শন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, টেলিপ্যাথি সহ বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এর পরের প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাটি খুবই প্রাচীন এবং অবৈজ্ঞানিক। স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর

বিবর্তনবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। 'প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?' প্রবন্ধটিতে ফরিদ আহমেদ ঐশ্বরিক শক্তির কাছে প্রার্থনার অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেছেন। 'মহাপ্লাবনের বাস্তবতা' প্রবন্ধটিতে অনন্ত বিজয় দাশ গানিতিক ভাবে হিসেব কষে এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখিয়েছেন যে, নূহের আমলের মহাপ্লাবনের বর্ণনা কেবল উপকথা কিংবা অতিকথন ছাড়া আর কিছু নয়। পরের প্রবন্ধটিতে যিশুর মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করেছেন ড. ওয়াহিদ রেজা। এর পরের প্রবন্ধে মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক-সন্ধান করেছেন দীক্ষক দ্রাবিড়। 'পরকালের পরাবাস্তবতা' প্রবন্ধটিতে দীপক চোপড়া পরকালের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে সমস্ত 'প্রমাণ' হাজির করেছেন সাম্প্রতিক 'Life After Death: Burden of Proof' বইয়ে তা যুক্তিনিষ্ঠভাবে খন্ডন করেছেন মাইকেল শারমার । শারমারের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন ফরিদ আহমেদ। আমরা ছোটবেলায় বাংলাদেশে শুনে শুনে বড় হয়েছিলাম নীল আর্মস্ট্রং নাকি চাঁদের মাটিতে নেমে আজান শুনে মুসলিম হয়ে গেছেন। এই বহুল প্রচলিত 'মিথ্যার বেসাতি'টিকে খন্ডন করেছেন লাইট হাউজ তার প্রবন্ধে। 'ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথমিটিকল মিরাকল অব কোরআন তত্ত্ব' - প্রবন্ধটিতে রাশাদ খালিফা কিভাবে কোরান টেম্পারিং করে তার বিখ্যাত '১৯ তত্ত্ব' হাজির করে কোরানের আলৈকিকতা দাবি করেছেন - তার মুখোশ উন্মোচন করেছেন নাস্তিকের ধর্ম কথা। এর পরের প্রবন্ধতে বিপ্লব পাল গনেশের দুধ খাওয়ার অলৌকিকতা খন্ডন করেছেন, যা বছর কয়েক আগে ভারতে হিন্দুদের মধ্যে গন-হিস্টেরিয়া তৈরী করেছিল। এর পরের প্রবন্ধটি এরিক ফন দানিকেনকে নিয়ে - যিনি বিগত শতকের আশি এবং নব্বই-এর দশকে খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন - মহাজাগতিক প্রানীরা একসময় পৃথিবীতে এসে আমাদের মানব সভ্যতার পত্তন আর বিকাশ ঘটিয়েছিলো, আর তার নিদর্শন আমরা পাই পিরামিড থেকে শুরু করে কুতুব মিনার পর্যন্ত অনেক কিছুতে- তাকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন স্বপন বিশ্বাস। অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধটিতে 'অলৌকিক সংখ্যাতত্ত্ব' নিয়ে যাবতীয় ভাঁওতাবাজির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন নাস্তিকের ধর্মকথা।

অষ্টম অধ্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মৌলবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। আমাদের উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমকে ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করে 'সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা' হিসবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু সেক্যুলারিজমের মর্মার্থ সেটি নয়, বরং ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না- এটাই যে সেক্যুলারিজমের মোদ্দা কথা, এবং সেটি যে কেউ স্পষ্ট করে বলেন না, তা ব্যাখ্যা করেছি। পরের কয়েকটি প্রবন্ধে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি উঠে এসেছে। অতীতে (এবং এমনকি বর্তমানেও) বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কিংবা মুক্তমনা দার্শনিক ধর্মীয় কোপানলে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়েছিলেন (কিংবা এখনো হচ্ছেন)। তার কিছু নমুনা এই প্রবন্ধগুলোতে পেশ করা হয়েছে। হাইপেশিয়াকে নিয়ে প্রবন্ধটিতে আমি গণিতজ্ঞ হাইপেশিয়ার বেদনাঘন উপাখ্যান বর্ণনা করেছি - কিভাবে একসময় খ্রীষ্টিয় মৌলবাদিরা তার দেহ টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছিলো। 'ব্রুনোর মৃত্যু এবং কিছু প্রশ্ন' -প্রবন্ধে ড. শহিদুল ইসলাম কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থনের জন্য কিভাবে খ্রীষ্টিয় চার্চের পুরোধারা জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিলো তার বর্ণনা হাজির করেছেন। তিনি আমাদের এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৯২ সালে - গ্যালিলিওর মৃত্যুর চারশ বছর পরে চার্চ গ্যালিলিওর প্রতি চার্চ যে অমানবিক আচরণ করেছিলো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করে; কিন্তু ব্রুনোর প্রতি চার্চ অদ্যাবধি এমন কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেনি। বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারটা যে কেবল খ্রীষ্টানদের একচেটিয়া ছিলো না, বরং 'ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে সত্যের শহীদ' যে কম নয়, তার বেশ কিছু নমুনা পেশ করেছেন নুরুজ্জামান মানিক তার প্রবন্ধে। ক্রিস্টোফার হিচেনস তাঁর প্রবন্ধে (অগ্নি অধিরূঢ় অনূদিত) দেখিয়েছেন ধর্ম জিনিসটা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব কিছুকে কিভাবে ধীরে ধীরে বিষাক্ত করে তুলছে। পরের প্রবন্ধে নুরুজ্জামান মানিক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ব্রুনো শুধু নয়, তার সমসাময়িক আরো অগনিত বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিলো ধর্মের ধ্বজাধারীরা- আমরা যেন সেগুলো ভুলে না যাই। এর পরের প্রবন্ধ - 'মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন প্রেক্ষিত' -এ রবিউল ইসলাম মৌলবাদের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এ থেকে মুক্তির কিছু উপায়ও বাৎলে দিয়েছেন। মোঃ জানে আলম তার প্রবন্ধে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং কিভাবে একে রুখা যায় তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের সব শেষ প্রবন্ধটিতে আমি ধর্মানুভূতি এবং ধর্মের অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি।

নবম অধ্যায়ে ধর্ম ও নারীর প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম প্রবন্ধে নন্দিনী হোসেন বর্ণনা করেছেন কিভাবে পুরুষদের রচিত 'ধর্ম' নারীদের সামাজিকভাবে বিকলাংগ করে রাখে। বিভিন্ন ইসলামী কিতাব ঘেঁটে নন্দিনী দেখিয়েছেন, ধর্মের মধ্যে থেকে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করাটা অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতন। হিন্দু ধর্মেও যে মেয়েদের অবস্থা খুব একটা ভাল কিছু নয় তা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ আর পুরাণ ঘেটে দেখিয়েছেন অনন্ত বিজয় দাশ তার ''সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী' প্রবন্ধে। অধ্যয়ের পরবর্তী প্রবন্ধ- 'চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার' তে রবিউল ইসলাম দেখিয়েছেন কিভাবে মোল্লারা ধর্মকে ব্যাবহার করে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখে চিরকাল। অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে দীক্ষক দ্রাবিড় মত প্রকাশ করেছেন যে, একটা সময় নারী পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানব সভ্যতার পত্তন ঘটিয়েছিলো, সেই নারীকে পরবর্তীতে ক্ষমতাহীন করেছে আসলে মনোথিইজম বা একক ঈশ্বরের প্রবক্তারা।

দশম অধ্যায়ে অন্যান্য প্রসংগ। 'সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্প বনাম বিবর্তনের শিক্ষা' প্রবন্ধে মেহুল কামদার (অনুবাদ- তানবীরা তালুকদার) বর্ণনা করেছেন কি ভাবে ধর্মের বিভিন্ন গালগপ্পগুলো এমন ভাবে মানুষের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে যে সেগুলো রীতিমত যুদ্ধ করে আমাদের তাড়াতে হচ্ছে। স্বজ্ঞা নিয়ে একটি সুন্দর লেখা লিখেছেন ড. দীপেন ভট্টাচার্য, তিনি দেখিয়েছেন এর অনেক কিছু সমাধানের জন্য ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান গবেষণার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে; তাঁর মতে এ এখনো সংঘাত- সমন্বয়ের উর্ধ্বে। মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত - এ নিয়ে সুগ্রন্থিত আলোচনা করেছেন অপার্থিব। সমকামিতা (সমপ্রেম) প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন ব্যাপার কিনা তা নিয়ে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছি আমি। একই বিষয় নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে একটি সম্পূরক লেখা লিখেছেন স্নিগ্ধা আলী। রিচার্ড ডকিন্সের মেয়ে

জুলিয়েটের দশম জন্মদিন উপলক্ষে তার মেয়েকে লেখা ডকিন্সের লেখা চিঠির অনুবাদ করেছেন অগ্নি অধিরূঢ়। 'আত্মঘাতী কুসংস্কার' প্রবন্ধে ড. প্রদীপ দেব দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজে জমে থাকা বিভিন্ন কুসংস্কারগুলো রীতিমত আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। 'মহাশূন্যে শিবলিংগ' প্রবন্ধটিতে ড. নৃপেন্দ্র নাথ সরকার তার ছোটবেলাকার বিভিন্ন ঘটনা সাজিয়ে মানুষের মধ্যে জমে থাকা কুসংস্কারের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। 'সর্বগ্রাসী অপ-'বাদ' বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর' প্রবন্ধে রণদীপম বসু কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর-এর জীবন দর্শন সহজ ভাষায় পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। বইটির সর্বশেষ প্রবন্ধ 'আমার স্বর্গ এখানে' তে ড. মীজান রহমান উল্লেখ করেছেন তিনি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোন পতিতালয় সদৃশ কোন স্বর্গ চান না, বরং তিনি মনে করেন, আমাদের মত অধার্মিক মানবতাবাদীদের স্বর্গ এখানেই, এই মহামানবের সাগরকূলে - যেখানে মনুষ্যত্ব আছে, নারীর প্রতি সম্মান আছে, কুমারী কিশোরীর প্রতি আছে স্নেহের দৃষ্টি, সেখানেই আমাদের স্বর্গ। ইন্টারনেটের মুক্তমনা সাইটের জন্য লিখিত এ প্রবন্ধগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আরো কিছু আকর্ষনীয় লেখা মূল বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বইটি সংকলনের শেষ মুহূর্তে সুরজিত মুখার্জী বিজ্ঞান এবং ধর্মের সংঘাত কিংবা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অর্থহীন উল্লেখ করে মোঃ জানে আলমের একটি প্রবন্ধ (এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) খন্ডন করতে সচেষ্ট হন। এই প্রবন্ধটি মুক্তমনায় কিছু বিতর্কের জন্ম দেয়। প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি নিজে একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। মোঃ জানে আলমও সুরজিত বাবুকে একটি উত্তর দেন। আমরা সেগুলো এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বছর খানেক আগে এক সময় জনাব মেসবাহউদ্দিন জওহের-এর সাথে আমার আস্তিকতা-নাস্তিকতা শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বিতর্ক হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক মনে করায় সেই বিতর্কটিকেও আমরা বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ বইয়ের সকল লেখক আর শুভানুধ্যায়ীদের যারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও বইটির জন্য লেখা দিয়েছেন এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আমরা আশা করব এ বইয়ের প্রবন্ধগুলো পাঠকের চেতনা জগতে সাড়া জাগাবে।

অভিজিৎ রায়
সম্পাদক, '**বিজ্ঞান ও ধর্ম** - সংঘাত নাকি সমন্বয়?'
জুলাই ২০০৮